

চতুর্থ অধ্যায়

চোখের সামনেই ঘটেছে বিবর্তন!

বন্যা আহমেদ

ভুরিভুরি বই রয়েছে বাজারে বিবর্তনের উপরে, বিজ্ঞানীরা প্রতিদিনই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন কিভাবে আমাদের চারপাশের প্রকৃতি, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিবর্তনের পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে। বিবর্তনবাদ তত্ত্ব আজকে আমাদের শুধু প্রাণের উৎপত্তি, বিকাশ, বিলুপ্তি এবং টিকে থাকার ব্যাপারটাই বুঝতে সাহায্য করছে না, আজকের এই জীবজগৎ কি করে ক্রমাগতভাবে বদলে যাচ্ছে এবং তা আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রাকে কিভাবে প্রভাবিত করছে তার একটা পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যাও দিচ্ছে। একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন বিবর্তনবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে না দেখলে আজকের এই আধুনিক জীবনযাত্রা থেকে অবশ্য প্রয়োজনীয় অগ্রগতি ও স্বাচ্ছন্দ্যের অনেকটুকুই বাদ দিয়ে দিতে হবে। আজকে বিবর্তনবাদের তত্ত্বকে বাদ দিলে - আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যাবে, মানুষ বা অন্যান্য জীবের ডি.এন.এর গঠন বুঝে জটিল অসুখের চিকিৎসা বের করা এবং রোগ প্রতিষেধক ভ্যাকসিন তৈরির কাজ বাদ দিয়ে দিতে হবে, পরিবেশের ভারসাম্যতা রক্ষা, দূষণ রোধ, গ্লোবাল ওয়ারমিং সহ বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা বন্ধ করে দিতে হবে, উন্নত জাতের ফসল তৈরি করার কাজ বা কীটনাশকের ব্যবহার বন্ধ করে দিতে হবে - বন্ধ করে দিতে হবে আরো হাজারটা গবেষণা ও আবিষ্কার যেগুলো লিখতে গেলে সত্যিকার অর্থেই প্রমাণ আকারের ‘মহাভারত’ হয়ে যাবে। আমাদের প্রতিদিনের জীবনে বিবর্তনবাদ তত্ত্বের গুরুত্ব আজকে এতখানিই যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পর্যন্ত এখন বিবর্তনীয় জীববিদ্যা, বিবর্তনীয় চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি নামে নতুন সব শাখারও সৃষ্টি করা হচ্ছে (১)।

বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত বিজ্ঞানী টি. ডব্‌জানস্কি (T. Dobzhansky, ১৯০০-১৯৭৫) ঠিকই বলেছিলেন যে বিবর্তনের আন্দোল্য বিচার না করলে জীববিজ্ঞানের কোন কিছুই কোন অর্থ হয় না (২)।

গত শতাব্দীতেই বিবর্তনবাদকে জীববিজ্ঞানের মূল শাখা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ডারউইন তার বিবর্তন তত্ত্ব প্রস্তাব করছিলেন প্রায় দেড়শো বছর আগে, তারপর থেকেই জেনেটিক্স, অনু-জীববিদ্যা, জিনোমিক্সসহ জীববিজ্ঞানের নতুন নতুন শাখায় যত অভাবনীয় আবিষ্কার হয়েছে তার সবই এক বাক্যে বিবর্তনবাদের পক্ষে রায় দিয়ে যাচ্ছে। লাখ লাখ ফসিলের মধ্যে এখন পর্যন্ত এমন একটাও ফসিল পাওয়া যায়নি যা কিনা প্রাণের বিবর্তনের ধারাবাহিকতাকেই সমর্থন করেনা। কিন্তু তাতেই বা কি? ধর্মীয় কুসংস্কার, গোড়ামী, নোংরা রাজনৈতিক কারণে আজও কিন্তু বিজ্ঞানের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বটিকে সামাজিকভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। আমেরিকাসহ সারা বিশ্বজুড়ে বিবর্তনবাদ বিরোধীরা অত্যন্ত সক্রিয়ভাবেই তাদের অপ-প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। ধর্মীয় এবং সামাজিক কুসংস্কারগুলোর বিরুদ্ধে ডারউইনের এই তত্ত্ব যে কত বড় আঘাত হেনেছে তা বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে বিংশ শতাব্দী জুড়ে রক্ষণশীলদের চালানো আমরণ সংগ্রামের নমুনা দেখলেই পরিষ্কার হয়ে ওঠে। তাদের একটা খুব প্রিয় যুক্তি হচ্ছে বিবর্তন নাকি চোখে দেখা যায় না, কাজেই তা অবৈজ্ঞানিক! হ্যা, এটা ঠিক কথা যে, প্রাণী বা উদ্ভিদের উপর বিবর্তন ঘটে খুবই ধীরে, সাধারণত লক্ষ লক্ষ বছর লেগে যায় এক প্রজাতি থেকে আরেক

প্রজাতির বিবর্তন ঘটতে, যা হয়তো এক প্রজন্মের জীবদ্দশায় দেখে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু বিজ্ঞান তো শুধু যা চোখের সামনে দেখা যায় তাই নিয়ে কাজ করে না - যদি তাই করতে তাহলে তো ফসিলবিদ্যা, জ্যোতির্পদার্থবিদ্যা, জৈব-ভূগোল কিংবা রসায়নবিদ্যার মত বিভিন্ন শাখাগুলোকে অনেক আগেই অবৈজ্ঞানিক বলে ধরে নিতে হত! পদার্থবিদ্যার কথাই ধরুন না, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কি চোখে দেখা যায়, পৃথিবীটা যে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে সেটাই বা কে চোখে দেখেছে? খালি চোখে দেখলে তো আসলেই মনে হয় সূর্যটা ঘুরে ঘুরে এদিক থেকে ওদিকে চলে যাচ্ছে, তাহলে কি প্রাচীনকালের মত আমরা তাই ভেবেই বসে থাকবো?

কিন্তু তার চেয়েও মজার ব্যাপার হচ্ছে যে, আজকাল আমরা আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সাহায্যে বিভিন্ন উদ্ভিদ, কীট পতঙ্গ, ভাইরাস এমনকি প্রাণীরও বিবর্তন যেমন পরিক্ষারভাবে ব্যাখ্যা করতে পারছি, তেমনি অনেক ক্ষেত্রেই তা মরামরি পর্যবেক্ষণও করতে পারছি।

প্রকৃতিতে যেমন নিত্য নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হচ্ছে তেমনি উন্নত ধরনের ফসল উৎপাদনের জন্য বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভিদ তৈরি করছেন - শুধু একটু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাকিয়ে দেখলেই দেখা যাবে যে আমাদের চোখের সামনেই অহরহ ঘটে চলেছে প্রাকৃতিক নির্বাচনসহ বিবর্তনের বিভিন্ন মেকানিজমের খেলা। আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে দেখেছিলাম পেপারড মথের বিবর্তন যেটা প্রায় দেড় শতাব্দী ধরে ঘটেছিল আমাদের চোখের সামনেই। চলুন তাহলে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনাবলী থেকে নেওয়া কিছু জলজ্যান্ত উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করা যাক, দেখা যাক আমাদের চোখের সামনে আসলেই বিবর্তন ঘটছে কিনা।

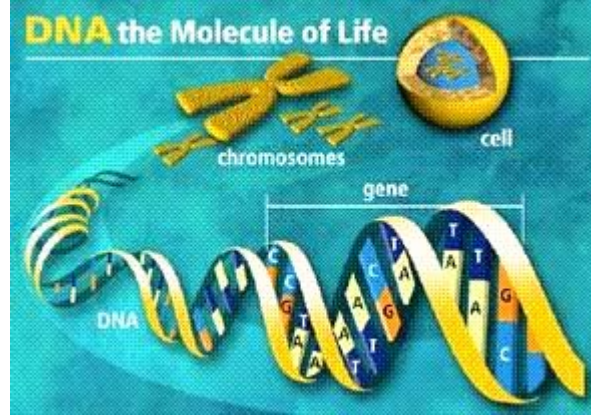
কেনো নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না এইডস রোগের অপ্রতিরোধ্য এইচ আই ভি ভাইরাস?

এইডস রোগের জন্য দায়ী এইচ আই ভি (HIV, Human immunodeficiency Virus) ভাইরাস নিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে আজ তোলপাড় চলছে। গত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে বিজ্ঞানীরা কেন নাকানি চুবানি খাচ্ছেন এই ভাইরাসটির প্রতিষেধক বা ভ্যাক্সিন (Vaccine) বের করতে? শুনলে হয়তো অবাক হবেন, আর কিছুই নয় - এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, আনুবীক্ষণিক ভাইরাসগুলো আমাদের সাথে খেলছে 'মিউটেশন' এবং 'প্রাকৃতিক নির্বাচনের' মাধ্যমে ঘটানো বিবর্তনের এক ভয়াবহ লুকোচুরি খেলা। বিজ্ঞানীরা একে মোকাবিলা করার জন্য যেই না একটা ওষুধ প্রয়োগ করছেন সেই মাত্র তারা বিবর্তিত হয়ে নতুন রূপে দেখা দিচ্ছে, নতুন নতুন ওষুধগুলোকে আক্ষরিক অর্থেই যেন নাকে দাঁড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে। এই 'লুকোচুরির' ব্যাখ্যা তো বিবর্তনবাদ তত্ত্ব ছাড়া আর কোন কিছু দিয়েই দেওয়া সম্ভব নয়!

১৯৮১ সালে এইডস রোগ ধরা পড়ার পর এখন পর্যন্ত ২৫ মিলিয়ন বা আড়াই কোটি লোক মারা গিয়েছে এই মারাত্মক রোগে, ২৫ বছর ধরে বিভিন্ন ওষুধের আবিষ্কারের পরও এর নিরাময়ের কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। বরং জাতিসংঘের এক সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, বিশ্বব্যাপী প্রায় ৪৫ মিলিয়ন মানুষ ভুগছে আজ এইডস রোগে, শুধু এবছর অর্থাৎ ২০০৫ সালে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৪.৩ - ৬.৬ মিলিয়ন, আর মারা গেছে ২.৮ - ৩.৬ মিলিয়ন মানুষ (৩)। তাহলে চলুন আরেকটু খতিয়ে দেখা যাক

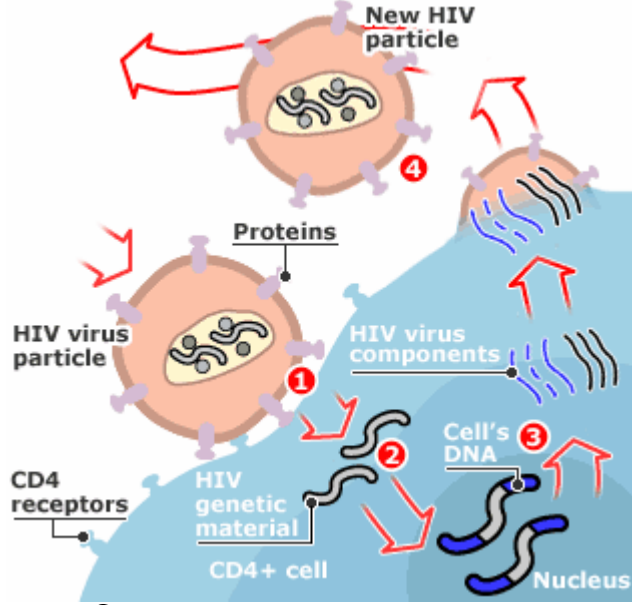
কেনো এই ভাইরাসটাকে কোন মতেই বাগে আনতে পারছেন না বিজ্ঞানীরা এখনও।

এই ভাইরাসগুলোর গঠন কিন্তু অত্যন্ত প্রাচীণ ধরণের, বংশগতির মূল উপাদান হিসেবে তারা আমাদের মত ডি.এন.এ (DNA, Deoxyribonucleic Acid) ব্যবহার করে না। তাদের এক কোষী দেহে ডি.এন.এ বলে কিছু নেই, আছে সেই প্রাচীণ আর.এন.এ (RNA, Ribonucleic Acid) - এই



মানুষের কোষের ভিতরের ক্রোমসম, ডি এন এর (DNA) এবং জীনের গঠন, ভাইরাসের এক কোষী দেহে এই ডি এন এ নেই, তার বদলে আছে আর এন এঃ সৌজন্যঃ <http://www.okstate.edu/artsci/zoology/ravdb/files/Chrom-dna.jpg>

আর.এন.এ এর মাধ্যমেই ভাইরাসগুলো পরবর্তী প্রজন্মে তাদের জীন ছড়িয়ে দেয়। আর গোল বাঁধলো সেখানেই - ডি.এন.এ নেই বলে তারা নিজে নিজে স্বাধীনভাবে বংশ বৃদ্ধি করতে পারে না! বংশবৃদ্ধি করার জন্য ডি.এন.এ -ওয়ালা কোন উপযুক্ত পোষকের (host) দেহ কোষের ভিতরে ঢুকে পড়া ছাড়া আর উপায় কি? এক্ষেত্রে এইচ আই ভি ভাইরাসগুলো পোষক হিসেবে মানুষের দেহের কোষকে ব্যবহার করে (নীচের ছবিতে দেখুন)। দেহকোষে একবার ঢুকে পরার পর অত্যন্ত দ্রুত গতিতে লক্ষ লক্ষ কপি তৈরি করার মাধ্যমে নিজের বংশবৃদ্ধি করতে শুরু করে দেয়। মানুষের কোষে বিশেষ কিছু প্রোটিন আছে যাদেরকে বলা হয় রিসেপ্টর (Receptor, যেমন ধরুন, CD4, CCR5 ইত্যাদি); - এদের সাথে নিজেকে জুড়ে দিয়েই তারা কোষের ভিতর ঢুকে পরে(৪)। তারপর বিশেষ এক প্রক্রিয়ায় সে মানুষের কোষের ডি এন এর উপর ভর করে তার ভিতরেই আর এন এর কপি তৈরি করে ফেলে।



মানুষের কোষের (নীল অংশ) ভিতর এইচ আই ভি ভাইরাসের বংশবৃদ্ধির বিভিন্ন ধাপ
<http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/4434806.stm>

সেখান থেকেই ভাইরাসটির অসংখ্য কপি তৈরি হয়ে মানুষের দেহের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পরে এবং ধীরে ধীরে তার রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে (immune system) ধ্বংস করে দিতে থাকে। আচ্ছা, এ ভাবেই না হয় ভাইরাস বংশবৃদ্ধি করে, তাতে অসুবিধাটা কোথায়? এর সাথে তাকে প্রতিরোধ করার বা বিবর্তনেরই বা কি সম্পর্ক আছে?

আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে দেখেছি, কোন জীবের উপর প্রাকৃতিক নির্বাচন কাজ করতে হলে তার নিজস্ব জনপুঞ্জের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে প্রকারণ (Variation) থাকতে হয়। জীবন সংগ্রামে যে সব প্রকারণ জীবকে পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে বেঁচে থাকতে বেশী সুবিধা করে দেয় সেই সব জীবের অধিকারী জীবগুলোই বড় হওয়া পর্যন্ত টিকে থাকে। আর অন্যদিকে যারা পরিবেশের সাথে কম খাপ খাওয়াতে পারে তারা ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যায়। এটাই সংক্ষেপে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মূল কথা। আবার অন্যদিকে, জীবের মধ্যে বিভিন্ন সময় আকস্মিক কিছু পরিবর্তন ঘটে থাকে যার ফলশ্রুতিতে অনেক সময় ডি এন এর গঠন বা সংখ্যারও পরিবর্তন ঘটে যায় - আর একেই বলা হয় মিউটেশন বা পরিব্যাপ্তি। এই মিউটেশন কিন্তু প্রাণীর প্রয়োজনে ঘটে না, ঘটে একেবারেই বিক্ষিপ্ত এবং এলোমেলোভাবে। অঙ্ক কষার সময় কখন আনমনা হয়ে একটা ভুল করে ফেলবেন সেটা যেমন আগে থেকে বলা যায় না তেমনি বংশবৃদ্ধি করার সময় আপনার জীবের কোন অংশটার কপি করতে ভুল হয়ে যাবে সেটাও বলার কোন উপায় নেই। পরিবেশ, প্রাণীর কোষের গঠন ইত্যাদির উপর এটা নির্ভর করলেও করতে পারে। কিন্তু এই মিউটেশনের ফলে যে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যগুলো তৈরি হয় তা দিয়ে যদি কোন জীব বেঁচে থাকার জন্য বাড়তি কোন সুবিধা পায়, তাহলে প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মেই সেগুলো টিকে যায়। এখন ভাইরাসের বংশবৃদ্ধির জন্য এক ধরনের বিশেষ এনজাইমের প্রয়োজন হয়, যেটা মানুষের শরীরে থাকে না, শুধুমাত্র ভাইরাসের কোষেই তা খুঁজে পাওয়া যায়। Reverse Transcriptase(৫) নামের এই এনজাইমটি খুবই দুর্বল ধরনের প্রাচীন এক মেকানিজমে তৈরি, আর সে কারণেই দেখা যায় বংশবৃদ্ধির সময় সে জেনেটিক কোডগুলোকে সব সময় ঠিক মত কপি করতে পারছে না। ফলে পরবর্তী প্রজন্মের ভাইরাসগুলোর মধ্যে অনবরতভাবে অসংখ্য মিউটেশন (Mutation) ঘটতে থাকে। আর তাই দেখা যায় যে, প্রতি নতুন

প্রজন্মই অসংখ্য রকমের নতুন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ভাইরাসের সৃষ্টি হচ্ছে, অর্থাৎ মিউটেশনের কারণেই সৃষ্টি হচ্ছে নতুন নতুন প্রকারের। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মানুষের দেহের ভিতরে ভাইরাস যে শুধু অত্যন্ত দ্রুত হারে বংশবৃদ্ধি করে তাই ই নয়, তাদের মধ্যে এই মিউটেশনের কারণেই প্রকারের হারও থাকে অত্যন্ত বেশি। প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মেই এইচ.আই.ভি ভাইরাসের মধ্যে পরিবর্তন বা বিবর্তন ঘটতে থাকে অত্যন্ত দ্রুত হারে, আর তারই ফলশ্রুতিতে মানুষের দেহে তারা খেলতে থাকে অদম্য এক ভয়াবহ বিবর্তনের খেলা। বিজ্ঞানীরা অতীতে বিভিন্ন পদ্ধতিতে এইচ.আই.ভি প্রতিষেধক ওষুধ আবিষ্কার করেছেন এবং এখনও নতুন নতুন ওষুধ তৈরির প্রচেষ্টা এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন। যেমন ধরুন, এক ধরণের ওষুধ দিয়ে তারা চেষ্টা করেছেন ভাইরাসটির Reverse Transcriptase এর কাজে বাঁধা দিতে, যাতে তারা মানুষের কোষের ডি এন এর ভিতরে ঢুকতে না পারে। আবার অন্য আরেক ধরণের ওষুধ তৈরি করা হয়েছে যাতে করে ভাইরাসগুলো মানুষের দেহের কোষের রিসেপ্টরের সাথে জুড়তেই না পারে। কিন্তু ব্যাপারটা এত সোজা নয়, এখানে আরেককটু গোলমালে ব্যাপার আছে। এই ওষুধগুলো দিয়ে আপাতভাবে এইডসের রোগীর দেহে ভাইরাসের প্রকোপ অল্প কিছু সময়ের জন্য বন্ধ করা গেলেও শেষ পর্যন্ত দেখা যায় এদের কোনটা দিয়েই কোন কাজ হচ্ছে না। কয়েক মাস বা বছর ফুরোলেই এইচ আই ভি ভাইরাসগুলো আবার প্রবল বিক্রমে রোগীর দেহে ফিরে আসে। চলুন তাহলে দেখা যাক কেনো এই ওষুধগুলো বারবার ব্যর্থ হচ্ছে।

ঘটনাটা আসলে আর কিছুই নয়। আমরা আগেই দেখেছি, ভাইরাস খুব দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে এবং খুব কম সময়ে ভাইরাসগুলোর মধ্যে খুব বেশী হারে মিউটেশন হয় বলে এদের মধ্যে হাজারো রকমের বৈশিষ্ট্যের হের ফের দেখা যায়। তার ফলে রোগীর দেহে কোন একটা বিশেষ ওষুধ প্রয়োগ করার পর বেশীরভাগ ভাইরাস মরে গেলেও, এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের ভাইরাস সবসময়েই থেকে যায় যাদের উপর ওই ওষুধটা কোন কাজ করতে পারে না। তারাই বেঁচে থাকে এবং কিছুদিনের মধ্যে আবারো বংশবৃদ্ধি করে সারা দেহে ছড়িয়ে পরে। তবে এবার যে ভাইরাসগুলো বেঁচে থাকলো এবং তাদের থেকে যে এক নতুন ভাইরাসের প্রজন্ম সৃষ্টি হলো তাদের সবার মধ্যেই ওষুধটি প্রতিরোধ করার ক্ষমতা সৃষ্টি হয়ে গেছে। তার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই ওষুধটি সম্পূর্ণভাবে অকেজো হয়ে যায় ওই রোগীর শরীরের রোগ নিরাময়ে।

আম্মে এখনে আমরা খান্নি চোখেই দেখতে পাচ্ছি ডারউইনের বলে যাওয়া মেই প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে দ্বিটা বিবর্তনের এক মোক্ষম উদাহরণ। পার্থক্য এতটুকুই যে এই বিবর্তনশীল দ্বিটাই আম্মাদের চোখের আম্মনে, অতি দ্রুত, আনুভূতিকভাবে মানুষের শরীরের ভিতর; আর ডারউইন তাদেরকে দেখেছিলেন প্রকৃতির বিভিন্ন পরিবেশে বা দক্ষিণ আম্মেরিকার গ্যালাপ্যাগাস দ্বীপপুঞ্জ।

একেকটা রোগীর দেহ যেনো ডারউইনের সেই গ্যালাপ্যাগাস দ্বীপপুঞ্জের একেকটা দ্বীপ - ফিঞ্চ পাখিগুলো যেমন তাদের নিজস্ব দ্বীপের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে স্ততন্ত্রভাবে বিবর্তিত হয়েছিলো, তেমনিভাবে ভাইরাসগুলোও প্রত্যেকটা মানব শরীরের ভিতরকার বিচ্ছিন্ন পরিবেশে অনবরত বদলে যাচ্ছে - পোষকের শরীরের বিশেষ সব বৈশিষ্ট্য, রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা, রোগের চিকিৎসার ধরণ, ওষুধের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে স্ততন্ত্রভাবে বিবর্তন ঘটে চলেছে এই ভয়াবহ ভাইরাসগুলোর। কখন, কিভাবে, কোন আকস্মিক মিউটেশনের ফলশ্রুতিতে ভাইরাসগুলোর কিরকম বিবর্তন ঘটবে তা আগে থেকেই বলা মুশকিল। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, প্রত্যেক এইডসের রোগীর পরিস্থিতি এবং তার দেহের ভিতরে এইচ.আই.ভি ভাইরাসের

বিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ করে তারপর বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন ধরনের ওষুধের আবিষ্কার করতে হবে, তবেই না এ রোগ সারানো যাবে! এখন তাহলে একবার ভেবে দেখুন তো, যে বিজ্ঞানীরা আজকে এইডস রোগের ভাইরাসের ওষুধ বের করার কাজে নিযুক্ত আছেন তাদের এই পরিস্থিতিতে নিজের মাথার চুল ছেঁড়া ছাড়া আর কিইবা করার থাকতে পারে! ওনারা কি বছরের পর বছর ধরে প্রত্যেকটা রোগীকে আলাদা আলাদা করে পরীক্ষা করে প্রত্যেকের জন্য নতুন নতুন ওষুধ বানাবেন? এই জটিল সমস্যাটা সমাধানের জন্য চিকিৎসাবিদ এবং বিজ্ঞানীরা এখন দেখছেন শুধু একটি মাত্র ভ্যাক্সিন ব্যবহার না করে, অনেকগুলো ভ্যাক্সিনের ককটেল ব্যবহার করলে ঘটনা কি দাঁড়ায়; কয়েক বছর ধরে এ ধরনের ওষুধের প্রয়োগে এইডসের চিকিৎসার কিছুটা উন্নতি হয়েছে বলেও শোনা যাচ্ছে। এ যেনো অন্ধের তীর ছোঁড়ার মত, কখন কোন্ তীরটা নিশানাকে ভেদ করবে, আদৌ করবে কিনা তা আগে থেকে নিশ্চিত করে বলার কোন উপায় নেই। বিজ্ঞানীরা আজকে মানুষের দেহে এইচ.আইভি ভাইরাসের এই দ্রুত বিবর্তনের প্রক্রিয়া এবং বিভিন্ন ধরনের ওষুধের প্রয়োগে তাদের প্রতিক্রিয়া কি হয় তা আরও ভালো করে বোঝার চেষ্টা করছেন। বিবর্তনবাদকে গভীরভাবে বোঝা এবং তার যথাযথ প্রয়োগ ছাড়া এই মারাত্মক এইডস রোগের চিকিৎসা কি করে সম্ভব, বলুন তো? আজকে বিবর্তনবাদ বিরোধীরা যদি এই ওষুধ তৈরির কাজে নিয়োজিত হন তাহলে কোটি কোটি এইডসের রোগীর কপালে কি আছে তা তো আর বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না।

আজকে 'বার্ড ফ্লু' নিয়ে যে বিশ্বজোড়া মহামারীর আশঙ্কা করা হচ্ছে তার পিছনেও রয়েছে একই কারণ। এই বার্ড ফ্লুর ভাইরাসটিও খুব দ্রুত নিজেকে বদলে ফেলতে সক্ষম। আগে তারা শুধুমাত্র মুরগী বা পাখির মধ্যে রোগটির বিস্তার ঘটাতো পারতো, কিন্তু সাম্প্রতিককালে দেখা যাচ্ছে যে এক ধরনের মিউটেশনের ফলে তারা ইদানীং পাখি থেকে মানুষের দেহেও রোগ বিস্তার করতে সক্ষম হচ্ছে। এখন পর্যন্ত থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, তুরস্কসহ বেশ কয়েকটি দেশেই এই রোগে আক্রান্ত হয়ে বেশ কিছু মানুষ মারা গেছে। বিজ্ঞানীরা ভয় পাচ্ছেন যে মিউটেশনের ফলে যদি এদের মধ্যে মানুষ থেকে মানুষের দেহে সরাসরি রোগ ছড়ানোর ক্ষমতা তৈরি হয়ে যায় তাহলে তো আর উপায়ই নেই, বিশ্বজোড়া এক ভয়াবহ মহামারী ছড়িয়ে পড়তে পারে যে কোন মুহুর্তে। আবার এ রোগের ওষুধ আগে থেকে তৈরি করে অনেকদিন রেখে দেওয়া যায় না, তাই মহামারী শুরু হওয়ার পর এই রোগের ভ্যাক্সিন তৈরি করতে লেগে যাবে প্রায় ৮ মাস, ততদিনে হয়তো ভাইরাসগুলো বিবর্তিত হয়ে এমন একটা রূপ ধারণ করবে যে ওই ওষুধ আর কোন কাজই হবে না। ২০০৫ সালের এক রিপোর্ট অনুযায়ী এখন আমরা জানতে পারছি যে, ১৯১৮ সালের বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া মহামারীতে যে দুই কোটি লোক মারা গিয়েছিলো তার কারণ ছিলো এই একই ভাইরাস। আকস্মিক এক মিউটেশনের ফলেই তারা হঠাৎ করে পাখির বদলে মানুষের দেহে রোগ বিস্তার করতে শুরু করে দেয় - যার ফলাফল হয়েছিলো ভয়াবহ(৮)। আজকে এই মারাত্মক জীবানুগুলোর বিবর্তনের ধারাকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত ভ্যাক্সিন তৈরি করতে পারার উপরই নির্ভর করছে বিশ্বজোড়া মহামারী থেকে রক্ষা পাওয়ার এক মাত্র উপায়।

চলবে.....

আগের অধ্যায়গুলো.....

- এলাম আমরা কোথা থেকে? http://www.mukto-mona.com/Articles/bonna/elem_kotha_theke.pdf
- বিবর্তনে প্রাণের স্পন্দনঃ http://www.mukto-mona.com/Articles/bonna/bibortone_praner_spondon.pdf
- অনন্ত সময়ের উপহারঃ http://www.mukto-mona.com/Articles/bonna/ononto_upohar.pdf

References:

- 1) www.actionbioscience.org/evolution/pigliucci/html
Evolution's Importance to society: An Interview with renowned scientist Massimo Pigliucci. July 2005.
- 2) Myer, Ernst (2001), What is Evolution, Basic Books, New York, USA. pg 39
- 3) http://www.unaids.org/epi2005/doc/EPIupdate2005_pdf_en/epi-update2005_en.pdf
- 4) <http://www.thet.orech.org/genetics/news.php?id=13>
- 5) Ridley, Mark (2004), Evolution, BlackwellPublishing, Oxford, UK.
- 6) Discover, Special Issue, Volume 27, No-1, January 2006. pg 44

জানুয়ারী ১৭, ২০০৬

লেখক পরিচিতিঃ বন্যা (রাফিদা) আহমেদ বর্তমানে আমেরিকায় পাবলিক হেলথ সেকটরে সিস্টেম অ্যানালিস্ট হিসেবে কর্মরত। এর আগে কাজ করেছেন টেলি কমিউনিকেশনস ইন্ডাস্ট্রিতে, ফাইবার অপটিক্সের নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে প্রায় ৭ বছর। লেখাপড়া করেছেন বায়োটেকনলজি এবং কম্পিউটার সায়েন্সে। ইমেইল : bonna_ga@yahoo.com